আরাধিকা

সায়ন্তনী পূততুণ্ড

শিখী মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে গাইছিল-- 'নিভৃত প্রাণের দেবতা, যেখানে জাগেন একা/ ভক্ত সেথায় খোলো দ্বার, আজ লব তাঁর দেখা...'। এখন তাকে কেউ বিরক্ত করবে না। সকলেই জানে এখন তার সুরসাধনার সময়। শিখী গান গাওয়ার সময় কোনওরকম উৎপাত পছন্দ করে না। বিয়ের আগে থেকেই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নামজাদা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হওয়া। বিয়ের পরও লক্ষ্যমুখ অপরিবর্তিত। তার ধারণা ছিল যে, সচরাচর 'পরিণয়' নামক বস্তুটি আসলে প্রকারান্তরে মেয়েদের গুণাবলিকে উনুনে বিসর্জন দেওয়ার চক্রান্ত। অন্তত নিজের মাকে দেখে তেমনই ধারণা হয়েছে।
মা চমৎকার আবৃত্তি করতে পারেন। এই মুহূর্তের নামকরা আবৃত্তিকারদের টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তিনি! শোনা যায়, কলেজ সোশালে মায়ের তেজি আবৃত্তি শুনেই বাবা ঘাড় মচকে পড়েছিলেন। সাধারণ চেহারার শ্যামলা মেয়েটির কবিতাই হয়ে উঠেছিল তাঁর অমোঘ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু!
কিন্তু বিয়ের পর মা আর কখনও আবৃত্তি করেননি! শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী-সন্তানের জোয়াল কাঁধে চাপিয়ে সংসারের ভেলা ভাসিয়েছিলেন তিনি। আর তাতেই বিসর্জন গেল তাঁর প্রতিভা! শাউড়ি ভুরু কুঁচকে বললেন, "ঘরের বউ স্টেজে উঠে কবিতা বলে বেড়াবে! কী অনাছিস্টি!" যে স্বামী তাঁর কবিতাতেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনিও বললেন, "মা তো ঠিকই বলেছেন। এখন তুমি এ বাড়ির বউ। আমাদের সম্মান-অসম্মানের কথা তো ভাবতে হবে। অনুষ্ঠানে কবিতা না-ই বা বললে। বাড়িতে আপনমনে বলো। আমায় শোনাও। স্নান করতে করতে আবৃত্তি করো। কেউ তো বারণ করছে না!"
মা মেনে নিলেন। বলা ভাল পরিস্থিতির সঙ্গে সমঝোতা করে নিলেন। প্রথমে স্বামীর স্তোকবাক্যে নির্বোধের মতো বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—এ ফর্মুলায় আর যাই হোক প্রতিভার খিদে মেটে না! যখনই সঞ্চয়িতা নিয়ে বসেন তখনই শাশুড়ি হাঁক পাড়েন, "বউমা, কাপড়গুলো ছাতে মেলে দাও তো!" অথবা শ্বশুরের চায়ের ফরমায়েশ আসে। বাথরুমে ঢুকে আপনমনে কবিতা বলাও দায়। বাইরে থেকে তাড়া আসে, "তাড়াতাড়ি করো! কবিতাটা বাইরে এসে বললে হয় না?" স্বামীদেবতা যখন রাতে ঘরে আসেন, তখন তাঁকেও কবিতা শোনানো যায় না। কারণ তিনি তখন ক্লান্ত! বেশিরভাগই শুনতে হয়, 'পরে শুনব।' কোনওদিন যদি সুযোগ পেয়ে মা রবি ঠাকুরের 'সামান্য ক্ষতি' বা 'দেবতার গ্রাস' শুরু করলেন—মিনিট খানেক পরেই তাঁর কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে যায় স্বামীর প্রবল নাসিকাগর্জন!
অগত্যা মা আবৃত্তি করা ছেড়ে দিলেন। শিখী পরে প্রশ্ন করেছিল, "কেন এমন হল মা? বাবা তো তোমার প্রতিভাকেই ভালবেসে ছিলেন! তবে সারাজীবন সেই

প্রতিভাকে ব্যর্থ করে রাখলেন কেন?"
মা মৃদু হেসেছিলেন, "এর উত্তর দেওয়া মুশকিল। কিন্তু আমার মনে হয়, পুরুষেরা মেয়েদের প্রতিভা পছন্দ করে না, পছন্দ করে প্রতিভাশালী একটি বউ। বন্ধুদের কাছে যার প্রতিভার বড়াই করা যায়! 'আমার বউ নাচ, গান, আবৃত্তি জানে' বলতে ওদের ভাল লাগে! কিন্তু সেই বউ নিজের দমে আর পাঁচজনের মধ্যে তার প্রতিভার বিকাশ করুক, নিজের পরিচয় তৈরি করুক—এটা ওরা পছন্দ করে না। স্ত্রীর গুণ ওদের নিজেদের গর্বের কারণ হয়—তার পরিচয় নয়! ওরা শুনতে ভালবাসে—'অমুকবাবুর স্ত্রী দারুণ গান বা আবৃত্তি করে!' কিন্তু যদি উলটোটা হয়, যদি কেউ বলে—'উনি শিল্পী অমুকদেবীর স্বামী। বিরাট চাকরি করেন!' তাহলেই পৌরুষে আঘাত লাগে।"
মা যে অনেক দুঃখে কথাগুলো বলেছিলেন তা বুঝেছিল শিখী। তাই রবীন্দ্রভারতীতে এম মিউজ করার পর যখন তার বিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হল তখন স্পষ্টভাষায় প্রত্যেকবার পাত্রপক্ষকে জানিয়েছিল—গান কন্টিনিউ করতে দিতে হবে। গান কোনও মূল্যেই ছাড়তে পারব না, বরং স্বামী-সংসার ছাড়তে পারি।

আমার মনে হয়, পুরুষেরা মেয়েদের প্রতিভা পছন্দ করে না, পছন্দ করে প্রতিভাশালী একটি বউ।

মেয়ের এইরকম ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা শুনে 'বাপরে' বলে অনেক পাত্রপক্ষই পালিয়ে গিয়েছিল। অনেকে দেঁতো হেসে বলেছিল, "তা আর অসুবিধে কী? আমরা সকলেই গান শুনতে ভালবাসি। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে গান শুনতে ভালই লাগে, হেঁ হেঁ হেঁ।"
শিখীর স্পষ্ট জবাব, "তাহলে একটি রেডিও কিনে নিন। অবসর বিনোদনের জন্য গানজানা মেয়ের দরকার নেই।"
বাবা চটে গিয়ে মাকে বললেন, "তোমার মেয়ের কিছুতেই বিয়ে হবে না। লজ্জা-শরমের বালাই নেই। চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলে! এমন মেয়েকে কে ঘরের বউ করবে!"
বাবা যদি জ্যোতিষী হতেন তবে তাঁর ব্যবসা লাটে উঠত! কারণ এই কথা বলার ঠিক দু'সপ্তাহ পরেই শিখীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পুষ্পল এককথায় গান পাগল। মেয়ের গান শুনে সে পুরো কাত! সবার সামনেই বলে ফেলল, "এমন কণ্ঠস্বর নিয়ে বসে থাকাটাই অন্যায়। আপনার রেকর্ড করা উচিত!"
শিখীর কথাগুলো ভাল লেগেছিল। সে মৃদুস্বরে বলল, "সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই করব।"
"প্রতিভা থাকলে সুযোগ আসবেই।"
পুষ্পলের সপ্রতিভ উত্তর, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস...।"
"শুধু প্রতিভাটাই শেষ কথা নয়।" শিখী বলে, "সহযোগিতাও প্রয়োজন। মেয়েরা যা একেবারেই পায় না।"
সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল ওঁদের কাছ থেকে। শিখীর শাশুড়ি মৃদু হেসে বলেছিলেন, "মেয়েদের স্বনির্ভর হতে দেখলে ভাল লাগে। তুমি শিল্পী হতে চাইলে কেউ তোমায় বাধা দেবে না মা। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।"
কথা রেখেছেন তিনি। পুষ্পলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে প্রায় একবছর হতে চলল। এর মধ্যেই শিখী প্রথম ব্রেক পেয়ে গেছে। একটা নামকরা মিউজিক কোম্পানি থেকে নিজের গানের সিডি বের করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাকও পেতে শুরু করেছে। বাড়ি থেকে কোনওরকম বাধা তো দূর, সহযোগিতাই পেয়েছে সে। পুষ্পলের অফিসে যতই কাজের চাপ থাকুক না কেন—শিখীর প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে সে উপস্থিত থেকেছে। উৎসাহ দিয়েছে। শাশুড়িমা তাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, "সব শিল্পেরই একটা ড্রেস কোড আছে শিখী। আধুনিক গানের শিল্পীরা যদি ছেঁড়া জিনস পরে ভূত সেজে স্টেজে ওঠে, তাতে কোনওরকম সমস্যা হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর সাজ মার্জিত হতে হয়। স্নিগ্ধ হতে হয়।" বলতে বলতেই কখনও তার গলায় নিজের একছড়া সাদা মুক্তোর মালা পরিয়ে দিয়েছেন, কখনও বা খোঁপায় গুঁজে দিয়েছেন নিজের হাতে তুলে আনা ফুল।
এমন শ্বশুরবাড়ি পাওয়া ভাগ্যের বিষয়। শাশুড়ি আর স্বামীর তো তুলনাই হয় না। শুধু শ্বশুর আর তাঁর পেয়ারের কুকুর ডেভিলই ব্যতিক্রম। শ্বশুরমশাই এমনিতে নির্লিপ্ত থাকেন। বাধাও দেন না, উৎসাহও দেন না। শুধু ভোরবেলা যখন শিখী রেওয়াজ করে তখন অসময়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সামান্য বিরক্ত হন। সমস্ত অভিযোগ গিয়ে পড়ে দেওয়ালের উপরে। দেওয়ালগুলো কেন নিজে থেকেই সাউন্ডপ্রুফ হয় না তা নিয়ে কিছুক্ষণ গজগজ করেন। তারপর কানের উপর বালিশ চাপা দিয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ডেভিল নামেও ডেভিল, কাজেও ডেভিল! পাজির পাঝাড়া! শিখী গান গাইতে শুরু করলে বোধহয় তারও সুরসাধনার শখ জাগে! 'সা' বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেও গম্ভীর গলায় সুর ধরে—'ঘ্রা-ঘ্রা-ঘ্রাউ-উ-উ-উ!' প্রথম প্রথম ভীষণ সমস্যা হত। কাঁহাতক গ্রে হাউন্ডের চেঁচানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রেওয়াজ করা যায়। অবশেষে পুষ্পলই সমস্যার সমাধান করল। ভোরের সুখনিদ্রা বাতিল করে সে ডেভিলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মর্নিংওয়াকে। তারপর থেকেই সকালের কয়েকঘণ্টা শিখীর সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব কাটে। তার রেওয়াজে বাধা পড়ে না।
কিন্তু আজ পড়ল।
পাশের ফ্ল্যাটে রোজ সকালেই এই সময়ে রেডিও বাজে। আজকাল ভোরের দিকে বাংলা এফএম চ্যানেলে রবীন্দ্রসংগীত বাজানো হয়। মাঝে মধ্যেও ও ফ্ল্যাট থেকে গানের মৃদু সুর শিখীর কানেও আসে। কিন্তু তাতে তার সাধনার ব্যাঘাত ঘটে না। অথচ রেডিওতে আজ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই থমকে গেল সে। তানপুরাটা কোনওরকমে নামিয়ে রেখেই তাড়াতাড়ি চালিয়ে দিল এ বাড়ির রেডিওটা। নব ঘোরাতেই এফএম চ্যানেলে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সেই কণ্ঠস্বর। শিখীর বুকে স্মৃতির ঝড়! কতদিন পরে...! কতদিন পরে সেই কণ্ঠস্বর! কতদিন পরে সেই মধু ঝরা গলা! সেই অপূর্ব গায়কি! যাঁর গান শুনে বড় হয়েছে সে! যে শিল্পী রবীন্দ্রসংগীতকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন! আজীবন যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছে শিখী—যাঁর মতো গান গাইতে চেয়েছে—সেই রাধিকা গুপ্ত'র গান বাজছে এফএম চ্যানেলে! কণ্ঠস্বরে যেন অব্যক্ত বেদনা উপচে পড়ছে! সুর শান্ত সমাহিত হয়ে ধূপের গন্ধের মতো ছড়িয়ে পড়ছে!
সে নিজের রেওয়াজ ভুলে এক মনে দমবন্ধ করে গান শুনছিল। অবিকল সেই

বাচ্চা মেয়েটার মতো! যার স্বপ্ন ছিল—'বড় হয়ে আমি রাধিকা গুপ্তর মতো গান গাইব।' রেডিওতে তখন কোকিলকণ্ঠী গেয়ে চলেছেন— 'চিনিলে না আমারে কি... চিনিলে না...!'

দুই

"ওরে বাবা রে... উহু... উহু...উহু...!"
শিখীর শ্বশুরমশাই পরিমলবাবু এখনও অসুখ হলেই ছেলেমানুষি শুরু করেন। সকালবেলা এমন 'বাপরে', 'মা-রে' করছিলেন যে মনে হচ্ছিল তাঁর ভয়ঙ্কর কিছু হয়েছে! শিখী রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিল। উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "বাবা, কী হয়েছে? কী কষ্ট হচ্ছে?"
পরিমল উঃ আঃ করতে করতেই বললেন, "গা পুড়ে যাচ্ছে! মাথা ব্যথা করছে... হাত পা চিবোচ্ছে... মরে গেলাম... মরে গেলাম... উঃ! খোকা কোথায়? তোমরা সবাই মিলে মিটিং করে ঠিক করো আমাকে বাড়িতে রাখবে, না হাসপাতালে অ্যাডমিট করবে!"
সে মানুষটার কপালে হাত রেখে উত্তাপের মাত্রা বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু নাঃ—জ্বরের লেশমাত্রও নেই! কপাল একেবারে পাথরের মতো ঠান্ডা! তবু চিন্তিত হয়ে পুষ্পলকে বলল, "বাবার বোধহয় খুব জ্বর হয়েছে! ডাক্তারকে কল দিলে হয় না?"
পুষ্পল হেসে ফেলল, "খুব জ্বর? কত জ্বর হয়েছে জানো? থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছ?"
"তা দেখিনি। কিন্তু...।"
সে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলে, "সকাল থেকে আমি আর মা প্রায় দশ-বারোবার থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছি। প্রত্যেকবারই সাতানব্বই! বাবার ধারণা থার্মোমিটারটা চক্রান্ত করে ভুলভাল রিডিং দেখাচ্ছে! আর আমার ধারণা বাবার কিছু হয়নি। স্রেফ প্লেন সর্দি।"
শিখী অবাক! সামান্য সর্দিতেও কেউ হাঁকডাক করে বাড়ি মাথায় তুলতে পারে এমন ধারণা তার ছিল না। পুষ্পল টাইয়ের নট বাঁধতে বাঁধতে বলল, "অল্পেই লম্ফঝম্প করা বাবার চিরকালের অভ্যাস। চিন্তা কোরো না। মা সামলে নেবেন। তুমি বরং তোমার প্রোগ্রামের জন্য কনসেন্ট্রেট করো। আমি বরুণদাকে বলে দিয়েছি। উনি দলবল নিয়ে সাড়ে চারটে নাগাদ রিহার্সালের জন্য চলে আসবেন।"
অনেক চেষ্টা, ধৈর্য ও অপেক্ষার পর অবশেষে শিখীর জীবনে আকাঙ্ক্ষিত দিনটি আসতে চলেছে। এতদিন অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে প্রোগ্রাম করেছে। এবার তার প্রথম সোলো প্রোগ্রাম! রবীন্দ্রসদনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিখ্যাত সমালোচকদের সামনে এই প্রথম সে একা পারফর্ম করবে। আধঘণ্টা, একঘণ্টা নয়—পাক্কা দু'ঘণ্টার অনুষ্ঠান! গুরুজি যখন প্রথম খবরটা জানিয়েছিলেন তখন আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ও পেয়ে বসেছিল শিখীকে। হঠাৎ করে মনে হয়েছিল—সে পারবে তো? যদি বেসুরো হয়ে যায়! অথবা যদি গলা দিয়ে আওয়াজই না বেরোয়! কিংবা...!
গুরুজি হেসে বলেছিলেন, "অমন সকলেরই মনে হয়। কিন্তু প্রথম গানটা ঠিকঠাক উতরে গেলেই সব দেখবে একেবারে ট্যাড়সের মতো লুপলুপে মসৃণ হয়ে যাচ্ছে। প্রথম গানটা তাই খুব সাবধানে বেছে নিতে হয়। যে গানটা তোমার হাজারবার রিহার্স করা, যে গানটা গাইতে গাইতে তুমি ভুল করলেও তোমার কণ্ঠ ভুল করবে না—এমন গানই বেছে নিও।"
শিখী অনেক ভেবেচিন্তে বেছে নিয়েছিল

> সমালোচকদের সামনে এই প্রথম সে একা পারফর্ম করবে। আধঘণ্টা, একঘণ্টা নয়—পাক্কা দু'ঘণ্টার অনুষ্ঠান!

সেই গানটাকেই, যেটা সে কিশোরীবেলা থেকেই গেয়ে আসছে। রাধিকা গুপ্ত'র রেকর্ড শুনে শুনে গানটা অবিকল তাঁরই গায়কিতে তুলেছিল সে। চোখ বুঁজে শুনলে মনে হত, শিখী নয়—রাধিকা গুপ্তই গাইছেন! অবিকল সেই নরম আকুলতা! সেই আকুল, বেদনাময় কণ্ঠকে একেবারে অবিকল উপস্থাপনা করত সে। আবার সে-ই গানটাকেই ফের কণ্ঠে তুলে নিল সে। পুষ্পল আর শাশুড়িমাকে গেয়ে শোনালও। পুষ্পল গানটা খুব মন দিয়ে শুনল। গান শুনতে শুনতেই তার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। শাশুড়ি মায়ের মুখ ভাবলেশহীন। গান শেষ হওয়ার পরে শিখী ভয়ে ভয়ে তাকায় শ্রোতা দু'জনের দিকে। পুষ্পল চুপ করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। শাশুড়িমা মৃদু হেসে 'বেশ' বলে উঠে গেলেন। এমন প্রতিক্রিয়ায় সে আরও ঘাবড়ে গেল। ভীত গলায় পুষ্পলের কাছে জানতে চায়, "গানটা কি খারাপ হয়েছে...?"
পুষ্পল গম্ভীর গলায় বলে, "না। খারাপ হয়নি। কিন্তু এমন ডেঞ্জারাস গান গাওয়ার কী দরকার!"
"ডেঞ্জারাস!" শিখী বুঝে উঠতে পারে না! সে বলল, "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে—গানটার লিরিকস দেখো! ডেঞ্জারাস নয়তো কী!"
"এতে ডেঞ্জারাসের কী আছে!"
"তুমি জানো না! কবিরা অত্যন্ত দূরদর্শী হন! তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী বহুবছর পরেও ফলে যায়। আর কবিগুরু তো সে ক্ষমতায় সবাইকেই টেক্কা দিয়েছেন! এই তো, কয়েকদিন আগে পাশের ফ্ল্যাটের সুকোমলবাবুর এক শ্যালকের অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হচ্ছিল। আজকাল আবার অপারেশন থিয়েটারেও গান চালাবার ফ্যাশন হয়েছে। যথারীতি অপারেশনের সময়ে রবীন্দ্রসংগীত বাজছিল—'ডেকো না আমারে, ডেকো না, ডেকো না / চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না /... কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না...' ইত্যাদি। শ্যালকবাবাজী দিব্যি বহাল তবিয়তে গান শুনে মাথা নাড়াচ্ছিলেন। বুঝতে পারেননি যে আসলে ওটা গান নয়, অ্যাপেন্ডিক্সের আত্মজীবনী এবং সাবধানবাণী! তিনি চিরকালই অঙ্কের মাস্টারি করে এসেছেন। 'কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না'—লাইনটার মর্মার্থ আর বুঝবেন কী করে! যথারীতি অপারেশনের পর নিজের সদাচ্ছিন্ন রক্তাক্ত অ্যাপেন্ডিক্সের দিকে 'কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে' ফিরে দেখলেন। এবং সে দৃশ্য দেখেই হার্টফেল ও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি! কবিগুরুর সাবধানবাণী বিফলেই গেল।"
শিখী বুঝল পুষ্পল স্রেফ ফাজলামি করছে। সে মৃদু হেসে বলে, "তাই বুঝি?"
"হ্যাঁ, শুধু তাই নয়...।" পুষ্পল হাসতে হাসতেই বলে, "নজরুলও কিছু কম যান না। এই তো, কয়েকদিন আগেই নীচের ফ্ল্যাটের শ্রীকুমার দত্ত রাতে হুইস্কি খেতে খেতে গান শুনছিলেন—'আমি দ্বার খুলে আর রাখবো না, পালিয়ে যাবে গো...।' সকালে ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলেন যে, সত্যিই পালিয়ে গেছে! না মেয়ে, কিংবা গিন্নী নয়, বাড়ির সমস্ত

আসবাবপত্র! কালার টিভি, ডিভিডি প্লেয়ার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন—এমনকী নগদ টাকা আর গিন্নির গয়নাও! রাতে হুইস্কির কৃপায় দরজায় তালা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। কবি নজরুল বারবার ইনিয়ে-বিনিয়ে সাবধান করা সত্ত্বেও কথা শোনেননি। অগত্যা!" ফিচেল হেসে সে বলল, "এখন তুমি আবার 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে' গাইতে যাচ্ছ! একেই কালবৈশাখীর সময়, তার উপর কে বলতে পারে, প্রোগ্রামের দিনে কলকাতায় সুপার সাইক্লোন বা আয়লা এইসান আছড়ে পড়ল যে রবীন্দ্রসদনের ছাতই উড়ে গেল!"

"ধ্যুত।" বিরক্ত হয়ে বলে শিখী, "গানটা ভাল লাগেনি সে কথা স্পষ্টাস্পষ্টি বললেই হয়। এত ভণিতা করার কী দরকার?"

পুষ্পল হেসে ফেলল। আদর করে তার গালটা টিপে দিয়ে বলল, "রাগ করে না রাগুনি... খুব ভাল হয়েছে গান। একটু ডেঞ্জারাস এই যা! নয়তো একদম পারফেক্ট! ইউ উইল রক বেবি।"

তার কথা বলার ধরনে শিখী না হেসে পারল না!

পুষ্পলের মতামত তো পাওয়া গেল। কিন্তু শাশুড়িমায়ের স্পষ্ট মতামত না জানা পর্যন্ত একটা অস্বস্তি মনে খচখচ করছিলই। ওঁর সব ভাল। কিন্তু শিখীর গানের ব্যাপারে তিনি অদ্ভুতরকমের নীরব। কোনওরকম সমালোচনা তো দূর—সংক্ষিপ্ত একটা অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে সবসময়ই এড়িয়ে যান। এমন নয় যে ভদ্রমহিলা গান শোনেন না, বা শুনতে ভালবাসেন না। শিখীর অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহও আছে। অথচ কিছু জিজ্ঞাসা করলে একটাই নির্লিপ্ত প্রতিক্রিয়া, "বেশ হয়েছে।"

এই একটা ব্যাপার শিখীকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে। পুষ্পলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করেছে। সে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। বলেছে, "মা তোমার গানের কী সমালোচনা করবেন? তুমি উঠতি স্টার। আর মাকে আজ পর্যন্ত আমি বাথরুমে ছাড়া আর কোথাও গান গাইতে শুনিনি। ওস্তাদ আমীর খাঁ যদি বক্কার মহম্মদ আলির কাছ থেকে সমালোচনা এক্সপেক্ট করতেন তাহলে ভেবে দেখো খাঁ সাহেবের কী অবস্থা হত!"

যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কথা। তবু শান্তি পায়নি শিখী। শাশুড়িমায়ের প্রতিক্রিয়া নেওয়ার জন্য সরাসরি হাজির হয়েছিল কিচেনে। তিনি তখন রুটি সেঁকছিলেন। ঘাড় না ঘুরিয়েই বললেন, "রুটিটা হয়ে গেলেই গরম জল করে দিচ্ছি।'

রোজ গরম জলে গার্গল করা তার অভ্যেস। ঠিক সময়মতো শাশুড়িমা-ই গরম জল করে দেন। শিখী গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, "আমি গরম জলের জন্য আসিনি মা। কিছু কথা ছিল।"

"বলো।"

"গানটা আপনার ভাল লাগেনি।" শিখী আস্তে আস্তে বলল, "তাই না মা?"

তিনি মৃদু হাসলেন, না মা। গানটা তুমি খুবই ভাল নকল করেছ। একেবারে নিখুঁত।"

"মানে?"

"মানে একটাই শিখী।" তাঁর মুখে স্মিত হাসি, "গানটাকে নিজের মতো করে গাও। কোনও প্রখ্যাত শিল্পীর অনুকরণে নয়। তোমার গানের মধ্যে সবসময়ই একটা অন্য প্রভাব থাকে। সে প্রভাবটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করো। নিজের ভঙ্গিতে, নিজের স্টাইলে গাওয়ার চেষ্টা করো। নয়তো তোমার সব গানই অন্য কোনও শিল্পীর নকল হিসেবে মানুষ

শুনবে। তোমার নিজস্ব গান শুনবে না! নিজস্ব পরিচয়ও তৈরি হবে না।"
কথাগুলো শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সে। মনে মনে রাগও হয়েছিল। তার সামনে এত বড় একটা সুযোগ আসছে। কোথায় উৎসাহ দেবেন তিনি—উলটে মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছেন! এখনও পর্যন্ত যাঁরা তার গান শুনেছেন, তাঁরা সকলেই ধন্য ধন্য করেছেন। এমনকী গুরুজিও বলেন, "তোমার গান শুনলেই রাধিকার কথা মনে পড়ে!" অথচ এই মহিলা তাকে সস্তা নকলের পর্যায়ে ফেলছেন!
ক্ষুব্ধ অভিমানে সে আর কখনও শাশুড়িমাকে গান শোনায়নি। এখন দু'বেলা যন্ত্রানুষঙ্গের সঙ্গে তালিম চলে। বরুণদা নামকরা সেতার শিল্পী। তিনি তাঁর টিম নিয়ে রোজ প্র্যাকটিসে আসেন। পুষ্পল অফিস থেকে ফিরে প্রায়ই রিহার্সাল শুনতে আসে। শ্বশুরমশাইও কখনও-সখনও উঁকি মেরে যান।
কিন্তু আজ পর্যন্ত শাশুড়ি মা এ ঘরে আসেননি! একবারও না! অথচ সময়মতো শিখীকে গরমজল করে দেওয়া, আদা-চা করে দেওয়া, ঠিক সময়ে খাবার-দাবার মুখের কাছে এগিয়ে দেওয়া, তার সহযোগী বাদ্যশিল্পীদের চা-জলখাবার করে দেওয়া—সব নিঃশব্দে করে যাচ্ছেন। পুত্রবধূকে যতরকমভাবে সহযোগিতা করা যায়, করছেন।
অথচ যার জন্য এত কিছু করা সেই গানের প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ নেই! শিখী মনে মনে চায়, মা অন্তত একবার এ ঘরে আসুন। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে তার গান শুনুন। হয়তো এ একরকম দুর্বোধ্য চাওয়া! হয়তো এক ধরনের অবুঝ ইচ্ছা! কিন্তু তবু সে চেয়েছিল। এখনও চায়...!
"দেখে যাও... দেখে যাও তোমাদের মায়ের কাণ্ড!" পরিমলবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "পা'টা একটু টিপে দিতে বললাম। দু'একবার টিপে দিয়েই তার হঠাৎ মনে পড়ল কিচেনের টেবিল মোছা হয়নি! এখন সে টেবিল মুছতে বসেছে! বলি কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? কিচেনের টেবিল? না আমার পা?"
শিখী দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সত্যিই তো! সে কার কাছে কী প্রত্যাশা করছে! যে মহিলা স্বামীর পা টেপেন, গৃহস্থালির খুঁটিনাটি নিয়েই যাঁর সময় কাটে—সংসারের বাইরে যাঁর কোনও দুনিয়াই নেই, তিনি শিখীর গানের সমালোচনা করবেন!
তবু বুকের ভিতরের খচখচানি যায় না। সবার ভূয়সী প্রশংসা, চরম স্বীকৃতিও কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়! একটি মাত্র মানুষের উদাসীন নীরবতাই মুখ্য হয়ে ওঠে। একটি মানুষের স্বীকৃতি পেল না বলে শিখীর সমস্তটা ব্যর্থ বলে মনে হতে থাকে! যেন একটি মানুষই তার আরাধনার পরীক্ষা নিতে বসে আছেন। অনেক উপরে... অনেক উঁচুতে... বিচারকের আসনে...!

তিন

'...আপনারে যবে করিয়া কৃপণ, কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন/ দুয়ার খুলিয়া হে উদারনাথ রাজসমারোহে এসো। / বাসনা যখন বিপুল ধূলায়, অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়/ ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র রুদ্রআলোকে এসো...।'
গুরুজি শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। শিখীর গান শেষ হওয়ার পরও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। নীরবে তার মাথা স্পর্শ করলেন। অনেকদিন পর তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। ধরা গলায় বললেন,
"অপূর্ব! অপূর্ব!"

> শিখী চায়, মা একবার এ ঘরে আসুন। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে তার গান শুনুন। এ একরকম দুর্বোধ্য চাওয়া!

শিখী তাঁকে প্রণাম করে। তিনি চোখের জল আলগোছে মুছে নিয়েছেন, "তুমি অনেক বড় হবে শিখী। তোমার গান শুনলেই রাধিকাকে মনে পড়ে! সেই আবেগ! সেই বেদনাবিধুর কণ্ঠ! রাধিকা যদি তোমার গান শুনত তবে ভীষণ আনন্দ পেত!"
সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এ স্বপ্ন কোনওদিনই সত্যি হবে না। রাধিকা গুপ্তকে গান শোনাতে পারলে সে ধন্য হয়ে যেত। কিন্তু ভদ্রমহিলা যেন কর্পূরের মতো উবে গেছেন গানের জগৎ থেকে। গুরুজির কাছ থেকেই শুনেছে তাঁর ইতিহাস। গুরুজি এবং রাধিকা একসঙ্গেই, একই গুরুর কাছে গান শিখতেন। রাধিকার বাবার মেয়ের সংগীতচর্চার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি ছিল! সংসারে কিছু গোঁয়ার মানুষ থাকেনই প্রতিভার সর্বনাশ করার জন্য! রাধিকার বাবা তেমনই একজন মানুষ। গানের বিষয়ে দগ্ধ কোকিলাহারী। স্বাভাবিকভাবেই মেয়ের স্বপ্নের সামনে তিনি প্রায় চিনের প্রাচীর তুলে রেখেছিলেন!
কিন্তু রাধিকা তাতে থামেননি। তিনি বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়ে গান শিখতেন। রাধিকা নামটা তাঁর ছদ্মনাম। নিজের নামে প্রকাশিত হওয়ার সাহস ছিল না। তবু প্রবল দুঃসাহসে ছদ্মনামটাকেই সম্বল করে নিজের কণ্ঠকে প্রকাশ করলেন। বেতারে, রেকর্ডে ছড়িয়ে গেল তাঁর গান। শিল্পীমহল ও সমালোচকবৃন্দ নড়েচড়ে বসল। শ্রোতারা 'আহা... আহা...' করতে শুরু করল।
রাধিকা কখনও স্টেজ শো করেননি। ভয় ছিল, বাবা জানতে পারবেন! বাবাকে লুকিয়ে চুপিচুপি আকাশবাণীতে আসতেন। গান গেয়েই তাড়াতাড়ি চলে যেতেন। গান রেকর্ডও করতেন এমনভাবে যেন কোনও গর্হিত অপরাধ করছেন! তাঁর গানের ভক্তরা কখনও তাঁকে দেখেনি। তিনি কখনও শ্রোতাদের কাছাকাছি যেতে পারেননি। কয়েকজন মুষ্টিমেয় মানুষ তাঁকে চিনত।
কিন্তু এতেও শেষরক্ষা হল না। রাধিকার বাবা কীভাবে যেন জানতে পেরে গেলেন যে তাঁর কন্যাটি আড়ালে আবডালে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি আর দেরি না করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। অসম্ভব প্রাচীনপন্থী এক পরিবারে বিয়ে হল তাঁর। সেখানে ঘরের বউয়ের গান গাওয়ার সুযোগ ছিল না।
তারপরও অবশ্য রাধিকা গান গেয়েছিলেন। ছদ্মনামটাই ছিল তাঁর ঢাল! তাঁর স্বামী যখন বাড়িতে থাকতেন না তখনই দৌড়ে আসতেন আকাশবাণীতে। দুপুর ছাড়া তাঁর সময় হত না। কারণ ওই সময়ে স্বামী বাড়ি থাকেন না। শাশুড়ি একটা ছোট্ট বেড়াল-ঘুম দিয়ে নেন।
সারাদিন সংসারের খাটুনিতে ক্লান্ত রাধিকা প্রাণের তাগিদে ছুটে আসতেন গান গাইতে। ঘামে ভেজা মুখ, ভীত সন্ত্রস্ত দু'টো ক্লান্ত চোখ একটু ঘুম চাইত। কপালে দুশ্চিন্তার রেখা প্রকট। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি গান গাইতে শুরু করতেন তখনই সব পালটে যেত! গুরুজির ভাষায়, 'তখন ওকে সত্যিই এক সাধিকা মনে

হত! জীবন ওকে যে দুঃখ দিয়েছিল সেই বেদনা ওর কণ্ঠে উপচে পড়ত। সুরের দুনিয়ায় প্রবেশ করলেই রাধিকার মুখ অদ্ভুত আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত! অদ্ভুত এক প্রশান্তি ভেসে উঠত চোখে-মুখে! তখন মনে হত ও অনেক দূরের মানুষ! সত্যিই রাধিকা! আরাধিকা!'

কয়েক বছর এমনভাবেই কাটল। তারপর একদিন রাধিকা তাঁর সংগীতজীবনে দাঁড়ি টেনে দিলেন! এর কৈফিয়ত তিনি কাউকেই দেননি। কিন্তু গুরুজি বুঝতে পেরেছিলেন সংসার শিল্পীকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। তাঁর ভিতরের সুরটুকুও আখের রসের মতো নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে দিয়েছে। স্বামী, সন্তান, সংসার সামলাতে সামলাতে সাধনার পথ থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছেন রাধিকা!'

গুরুজি একটু থেমে বলেছিলেন, "মেয়েদের এটাই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি শিখী। তোমার সঙ্গেও যে এ ঘটনা ঘটেনি তাতে আমি খুশি। তুমি অনেকদূর যাবে। অন্তত আর একটা প্রতিভার অকালমৃত্যু

আসলে গানে তার মনই নেই! মনের ভিতরে প্রবল তোলপাড় হতে থাকলে কি কারও গানে মন বসে!

আমায় দেখতে হবে না। সে বড় যন্ত্রণাদায়ক... বড় যন্ত্রণাদায়ক...!"

কথাগুলো মনে পড়তেই স্বস্তি বোধ করল শিখী। না, রাধিকা গুপ্ত'র মতো সে হারিয়ে যাবে না। তার শ্বশুরবাড়িতে কেউ সাধনায় ব্যাঘাত ঘটায় না! সংসারের সব কাজ শাশুড়িই সামলান। আর পুষ্পলের মতো স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা! কিন্তু তবু সে খুশি হতে পারছে না। আন্তরিক বেদনার মতো মনে খচখচ করে উঠছে একটা কথাই—তার শাশুড়ি তাকে স্রেফ নকলনবিশ ভাবেন! শিল্পী ভাবেন না!

কথাটা গুরুজিকে না বলে পারল না শিখী। গুরুজি কথাটা শুনে বেশ বিরক্ত হলেন, "এ আবার কী কথা! সামনে এত বড় একটা অনুষ্ঠান! এমন সময়ে কেউ একথা বলে! পাত্তা দিও না শিখী, তোমার শাশুড়ি তো সংগীত বিশারদ নন। তাঁর মতামতের মূল্যই বা কী?"

"গুরুজি, উনি সব সময়ই আমায় সাহায্য করেন। ওঁর কর্তব্যে কোনও ত্রুটি নেই।" সে আস্তে আস্তে বলে, "কিন্তু কখনই উনি আমার গান সম্পর্কে কিছু বলেন না! আমিও তো এক্সপেক্ট করতে পারি যে...।"

"না। পারো না!" গুরুজি ছোট্ট একটা ধমক দেন, "উনি যদি তোমার মা হতেন তবে তুমি প্রত্যাশা করতে পারতে। কিন্তু উনি তোমার মা নন... শাশুড়ি। যতই যা করুন—শাশুড়ি কখনও মা হয় না! এরপর থেকে তুমি ওঁর কোনও কমেন্টসে কান দেবে না। আমি চাই না—এই মুহূর্তে কোনও আনতাবড়ি অশিক্ষিত কমেন্ট শুনে তোমার মন ভেঙে যায়! গানে মনোযোগ দাও। যে যা বলছে—জাস্ট ইগনোর করো।"

গুরুজির কথা শুনে তার মন শান্ত হল। ঠিকই তো বলেছেন। সব কথায় কান দেওয়ারই বা দরকার কী? মা বলতেন, "সবার সব কথা শুনতে নেই। কিছু কথা ফেলে দিতে হয়, ভুলে যেতে হয়।"

ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল শিখী। গুরুজির কথা মতো শাশুড়িমাকে কয়েকদিন এড়িয়েই চলল। একদিন 'মা' বলে একবারও ডাকল না। শাশুড়িমা হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। হয়তো করলেনও না! তাঁর প্রশান্ত মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। তিনি তাঁর কর্তব্যে অবিচল!

শিখী চাইছিল তিনি যেন ওর বিরূপতা বুঝতে পারেন। যেন বুঝতে পারেন, তাঁর পুত্রবধূটি ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু যে লোকটি ঠিক করেছে সে কিছুতেই বুঝবে না, তাকে বোঝানোর উপায় কী! শিখী হাঁড়িমুখ করে বসে থাকলেও তিনি দিব্যি হেসে কথা বলেন। সে 'হুঁ... হাঁ' করে জবাব দেয়, বার্তালাপ এড়িয়ে যায়। তবু তাঁর কোনও হেলদোল নেই! সকাল হলেই উষ্ণ জলে লেবুর রস মিশিয়ে দিয়ে যান পুত্রবধূকে। সময়মতো তাকে খাবার-দাবার জোগান দিয়ে যান। যাতে তার প্র্যাকটিসে কোনওরকম বাধা না পড়ে সেদিকে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখেন। শিখী অভিযোগ করার কোনও রাস্তা না পেয়ে মনে মনে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। এত যত্ন কী জন্য? কিসের জন্য এত আদর? সে তো শিল্পী নয়—নকলনবিশ! তবে?

আহত শিল্পীর অবুঝ ইগো প্রত্যাঘাত করার সুযোগ খুঁজছিল। সুযোগ না পেয়ে আক্রোশ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। মাথা গরম হয়ে যায়! এখন গানে আর মন বসে না! রিহার্সালে অনেক সময়েই বোকার মতো ভুল করে বসে শিখী। বরুণদা অবাক হয়ে সেতার থামিয়ে দেন, "একি হচ্ছে শিখী! বেসুরো গাইছিস কেন? চড়ার দিকে পুরো ফলসেটো লাগছে! কী হল? কয়েকদিন আগেও তো চমৎকার গাইছিলি! প্রোগ্রামের ডেট যত এগিয়ে আসছে ততই ভুলভাল গাইছিস!"

শিখী কী বলবে বুঝতে পারে না। আসলে গানে তার মনই নেই! মনের ভিতরে প্রবল তোলপাড় হতে থাকলে কি কারও গানে মন বসে! যে কোনও সারস্বত সাধনাই ভীষণ স্বার্থপর! গোটা মনসংযোগটাই দাবি করে। তা দিতে না পারলে সমস্তটাই উলটোপালটা হয়ে যায়!

"তোর কী হয়েছে বল তো?" বরুণদা জিজ্ঞাসাই করে ফেলেন, "এনি প্রবলেম?"

শিখী মাথা নাড়তে গিয়েও থেমে যায়! চোখে পড়ল শাশুড়িমা হাতে ট্রে নিয়ে এদিকেই আসছেন। গানে ছেদ পড়েছে দেখে হয়তো ভেবেছেন এখন জলখাবারের সময় হয়েছে। চিংড়ির কাটলেটের সুগন্ধ ছড়িয়ে এগিয়ে আসছেন এদিকে।

এই সুযোগ! সে বলল, "কী করব বরুণদা। লোকে বলে আমি নাকি আসলে গান গাই না, স্রেফ রাধিকা গুপ্তকে নকল করি।"

শাশুড়িমা তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। এবার তাঁর দৃষ্টিতে ব্যথা ফুটল! "কোন মাথামোটা এসব বলেছে তোকে?" বরুণদা রেগে গিয়ে বললেন।

শিখী জয়োল্লাসে তাকায় তার প্রতিপক্ষের দিকে। ওঁর মুখে একঝলক কালো ছায়া ছাপ ফেলেই সরে গেল। সচরাচর তিনি প্রত্যুত্তর দেন না। কিন্তু আজ দৃঢ় স্বরে বললেন, "কথাটা আমি বলেছি। অবশ্য আমি মাথামোটাই, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই!"

চিংড়ির কাটলেটটা বরুণদার হাতেই রয়ে গেল! তিনি সবিস্ময়ে একবার শিখীর দিকে, আরেকবার তার শাশুড়ির দিকে তাকালেন। প্রথমে কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, "মাসিমা, আপনি বলেছেন! কিন্তু শিখী তো শুধু রাধিকার গুপ্ত'র গায়কিটাকেই ধরে রাখার চেষ্টা করছে!"

শাশুড়িমা হাসলেন, "এক একজনের গায়কির পিছনে অনেক রহস্য থাকে।

ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আর অনুভব দিয়ে তৈরি হয় এক একজনের গায়কি। সেটা মৌলিক। গায়কের কণ্ঠস্বরকে নকল করা যেতে পারে, তাঁর উচ্চারণ, স্টাইল—সবই নকল করা যায়। কিন্তু তাঁর অনুভবকে কী করে নকল করবে? যে গানটা তিনি গেয়েছেন, সেটা গাওয়ার সময় তিনি অন্তরে কী অনুভব করছিলেন—তা কি অন্য কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব?"

বরুণদাকে দেখে মনে হল, তাঁর সামনে কেউ চাইনিজ ভাষায় কথা বলছে। তিনি যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "সরি মাসিমা, আপনি কি গান শিখেছেন? আই মিন, গান গাইতে পারেন?"

ভদ্রমহিলা হাসলেন, "নাঃ, কিন্তু গান বুঝি। মাথামোটা হলেও ভাল গান-মন্দ গান, আসল-নকলের প্রভেদ বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে।" বলতে বলতেই তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, "তোমরা খেয়ে নাও। কাটলেট গরম গরমই খেতে ভাল লাগে।"

শিখী মুখ কালো করে বসেছিল। তাকে যেন পর্যুদস্ত করে রাজহংসীর মতো বিজয়িনী চলে গেলেন।

অফিস থেকে ফিরে সমস্ত ঘটনা শুনে পুষ্পল খেপে গেল। শিখী অবশ্য কিছুই বলেনি। সে বজ্রাহতের মতো বসেছিল। বরুণদাই অগ্রণী হয়ে পুষ্পলের সঙ্গে গোটা ঘটনাটা আলোচনা করলেন। বললেন, "এই সাস-বহু ইগোর ঠান্ডা লড়াইয়ে শিখীর প্রোগ্রামটা মাটি হতে বসেছে পুষ্পল। প্লিজ, টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি। এত বড় সুযোগ সবার জীবনে আসে না। আর যদি এই কারণে সেটা নষ্ট হয় তবে..."

পুষ্পল সব কথা শুনে গুম হয়ে বসে থাকল। শিখীর সঙ্গে কোনও কথা বলল না। মায়ের সঙ্গেও না। শিখীর নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। সারাদিন খেটেখুটে মানুষটা ফিরেছে। এখন কোথায় একটু হাসি, ঠাট্টা মশকরা করবে—তা নয়, মেজাজ খারাপ করে বসে আছে! সে চেষ্টা করল ব্যাপারটাকে হালকা করার। আস্তে আস্তে বলল, "পুষ্পল, প্লিজ রিল্যাক্স। তেমন সিরিয়াস কিছু নয়... সামান্য মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং..."

যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হল, "সামান্য মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং! সে জন্য তুমি রিহার্সালে সব ভুলভাল গাইছ! কাম অন শিখী—তুমি কি আমায় বাচ্চা পেয়েছ! কতবার বলেছি যে মা এসব কিছুই বোঝেন না! এতগুলো ওস্তাদ লোক দিনরাত তোমার প্রশংসা করছে—তাতেও তোমার হচ্ছে না! মা কী বললেন না বললেন—তাই ধরে বসে আছ! সামনে এতবড় একটা অনুষ্ঠান। আর তুমি এসব পেটি ইস্যু নিয়ে নিজেই নিজেকে ডিস্টার্ব করছ!"

শিখী কী বলবে ভেবে পেল না!

"ডিসগাস্টিং।" পুষ্পল বিরক্ত হয়ে উঠে গেল।

রাতে শিখীর ঘুম আসছিল না! পুষ্পল আজ ডিনার করেনি। শত অনুরোধ সত্ত্বেও মুখে কুটোটি কাটেনি। মা সম্ভবত ছেলের মুখ দেখেই গোটা ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন। তাই বেশি সাধাসাধি করেননি।

রাতে বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছিল না শিখীর। পুষ্পল অভুক্ত রয়েছে—এই চিন্তাটাই তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সমস্ত ঘটনার জন্য নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছিল। কী দরকার ছিল সামান্য ব্যাপারটাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করার! কত মানুষের মনে কত রকমের জটিলতা থাকে। হয়তো শাশুড়িমায়ের মধ্যে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স কাজ করছে। তিনি নিজে একজন সামান্য হাউসওয়াইফ। অথচ তাঁর পুত্রবধূ নামকরা শিল্পী হতে চলেছে। হয়তো শিখীর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে পারছেন না! এসব ভাবতে ভাবতেই একটু চোখ লেগে এসেছিল তার। সে নিজেও রাতে খেতে পারেনি। খালি পেটে আর যাই হোক, ঘুম আসে না। বেশ কয়েকবার এপাশ ওপাশ করতে করতেই কখন যেন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে চটকা ভেঙে গেল—

"তোমার কী দরকার ছিল সবার সামনে শিখীকে অপমান করার?" পুষ্পলের চাপা অথচ রাগত স্বর কানে এল, "সামনে এতবড় ব্রেক! শিখী আপসেট হয়ে আছে। তোমার সমালোচনা তোমার কাছেই রাখো। কী দরকার আর পাঁচজনের সামনে সে সব বলে নিজেকে আর শিখীকে হাস্যাস্পদ করার!"

মায়ের শান্ত গলা শুনতে পেল শিখী, "আমি তো কিছুই বলতে চাইনি খোকা।"

পুষ্পল এবার একটু শান্ত, "মেয়েটা এমনিতেই ঘাবড়ে আছে। ওকে আরও ঘাবড়ে দেওয়ার কী দরকার মা? যদি তুমি ওর প্রশংসা করো তাহলে কী এমন ক্ষতি হয়?"

"আমি মিথ্যে প্রশংসা করতে পারি না।" মা আরও শান্ত স্বরে বললেন, "হয় আমি কিছুই বলব না। নয়তো যা মনে হয়েছে, ঠিক তাই বলব।"

"কী মনে হয়েছে তোমার?" পুষ্পল ক্ষিপ্ত, "এ মনে হওয়া তোমার মানায় না! মা, শিখী মিউজিকে মাস্টার্স করেছে। সিডি বের করেছে। শিল্পীমহলে ওর নাম ডাক আছে। আর আমরা স্রেফ লে-ম্যান! তুমি যা জানো তা নিয়েই থাকো! তোমার ঘর, সংসার, রান্নাবান্না, ঠাকুরঘর। ও তো তাতে কখনই ইন্টারফেয়ার করছে না। কিন্তু যা জানো না, তা নিয়ে তর্ক করছ কেন? উলটোপালটা জ্ঞান দিয়ে ওকে কনফিউজ করার কী দরকার?"

"তা হলে কী করতে হবে? চুপ করে থাকব?"

> পুষ্পল সব কথা শুনে গুম হয়ে বসে থাকল। শিখীর সঙ্গে কোনও কথা বলল না। মায়ের সঙ্গেও না।

"তাই থাকবে।" পুষ্পল রেগে গিয়ে বলে, "গানের তুমি কী জানো? কী বোঝো? কখনও একঘর লোকের সামনে গান গেয়েছ? তোমার নলেজ বাথরুম সিঙ্গিং অবধি। ওই অবধিই রাখো। গুরুঠাকুর হতে যেও না। লোকে হাসবে!"

এরপর আর কিছু শুনতে পেল না শিখী। একটু পরেই পুষ্পল এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে চোখ বুঁজে বিছানায় পড়ে থাকে। মা-ছেলের অপ্রিয় কথা কাটাকাটি যে তার কানে এসেছে তা প্রকাশ করতে চায় না শিখী। পুষ্পলের কথাগুলোয় তার নিজেরও বক্তব্য ছিল। কিন্তু সে খুশি হতে পারল না। বরং একটা ব্যথা সূঁচের মতো তার বুকে বিঁধছিল। সে তো মল্লযুদ্ধ চায়নি—মুগ্ধতা চেয়েছিল। বিশেষ একটি মানুষের মুগ্ধতা! সেটুকুও অর্জন করতে পারল না। হয়তো এরপর শাশুড়িমা তার গানের প্রশংসা করবেন। কিন্তু সেটা নেহাতই লোক দেখানো! যেচে মান, কেঁদে সোহাগের মতো জোর করে আদায় করা।

শিখীর মনে হল, সে ক্রমাগত ছোট হয়ে চলেছে! আর একটি মানুষ তার এই ক্ষুদ্রতাকে উদাসীন অবহেলায় উপেক্ষা করে চলেছেন!

চার

পরদিন স্বয়ং গুরুজি বাড়িতে এসে উপস্থিত! শিখীর বিয়ের পর এই প্রথম এ বাড়িতে পদার্পণ।

শিখীর আগের রাতে একটুও ঘুম হয়নি। তার ক্লান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এভাবে হয় না মা। তুমি এখনই আমার বাড়ি চলো। পুষ্পল আজ সকালেই আমাকে ফোন করেছিল। ওর কোনও আপত্তি নেই। বরং মনে হল তুমি আমার বাড়িতে থাকলে ও একটু নিশ্চিন্ত হয়। এমনিতেও আমার বাড়িটা ভেনুর কাছাকাছি। তাছাড়া লাস্ট মোমেন্টে কিছু মনে হলে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তো আছিই। তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। তারাও মনে করছেন যে প্রোগ্রাম হওয়া অবধি তুমি আমার বাড়িতে থাকলেই ভাল হয়।"

এ প্রস্তাবে আপত্তির কিছু ছিল না। সত্যি বলতে কি, শিখীর এ বাড়িতে ক্রমশ দমবন্ধ হয়ে আসছে। গান গাওয়া তো দুর, যেন শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়! যে মানুষটা তার সব অস্বস্তির মূল, তাঁর সহযোগিতার চেয়ে কষ্টকর আর কিছু নেই! যিনি তার গান ভালবাসেন না, সেই মানুষটিই তার সংগীতসাধনার জন্য সবরকমের সহায়তা করে চলেছেন—এই দ্বিচারিতা দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সে। এখন গুরুজির কথায় মনে হল—হাতে স্বর্গ পেয়েছে!

"থ্যাঙ্কস গুরুজি।" সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, "তাহলে তো সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো?"

"একদম না।" গুরুজি হাসলেন, "তোমার গুরুমা এখনই লিস্ট করতে শুরু করেছেন যে কী কী মেনু তোমায় রেঁধে খাওয়াবেন। আমরা তো দোতলাতেই থাকি। একতলায় তুমি থাকবে। আজ সকালেই গিন্নি ওখানে তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা—আরও যা যা প্রয়োজন, সব শিফট করেছেন। তাছাড়া একতলার হলরুমটাও রিহার্সালের উপযুক্ত। কোনও সমস্যা হবে না। তুমি শুধু তোমার একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করে নাও।"

উৎসাহে শিখী প্রায় লাফিয়ে ওঠে। তারপরই কী ভেবে যেন স্তিমিতগলায় বলে, "গুরুজি। আর একজনের পারমিশনও লাগবে। আমার শাশুড়ির পারমিশন। আমি বললে সেটা ভাল দেখায় না। আপনি একটু বলবেন...?"

"নিশ্চয়ই।" গুরুজি নড়েচড়ে বসলেন, "কোথায় তিনি?"

"কিচেনে।" শিখী উঠে দাঁড়ায়, "আমি ডেকে আনছি।"

শাশুড়িমা তখন রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। বউমার গুরুজি এই প্রথমবার এ বাড়িতে এসেছেন। তাই তাঁর জন্য কিছু ভাজাভুজি করছিলেন। শিখীকে দেখে তার হাতেই লুচির প্লেট ধরিয়ে দিলেন, "তোমার গুরুজিকে দিয়ে এসো তো মা। আজ প্রথমদিন এসেছেন...।"

"মা..." শিখী লুচির প্লেটটা ধরে বলে, "গুরুজি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন। একবার আসবেন?"

তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করলেন, "অতবড় গুণিজন আমার সঙ্গে কী আলাপ করবেন?"

"আসুন না মা।" সে কাতর গলায় বলে, "ওঁর আপনার সঙ্গে আমার ব্যাপারে কিছু

আলোচনা করার আছে। আফটার অল, আপনি আমার গার্জিয়ান!"
ওঁর দু'হাতে ময়দা লেগেছিল। শাড়িতে হলুদ আর সরষের তেলের দাগ।
বেসিনে হাত ধুয়ে, আটপৌরে শাড়িটাকেই একটু গুছিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "চলো।"
গুরুজি তখন সেন্টার টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে উলটেপালটে দেখছিলেন। এগিয়ে আসা পদশব্দ শুনে চোখ তুলে তাকালেন।
প্রথমেই লুচির প্লেট নিয়ে শিখী ঢুকল। তার পিছন পিছন কাঁচা-পাকা চুলের এক প্রৌঢ়া!
'নমস্কার... আমি...!" সৌজন্যমূলক নমস্কারটা অসমাপ্তই রয়ে গেল।
গুরুজি হাঁ করে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন প্রৌঢ়ার দিকে! হতবাক! যেন কথা বলতেই ভুলে গিয়েছেন! তড়িদাহতের মতো কেঁপে উঠলেন! যেন বিশ্বের অষ্টমাশ্চর্য তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে!
স্খলিত গলায় কোনওমতে বললেন, "তু-মি!"
শিখী অবাক হয়ে দেখল তার শাশুড়িমাও যেন স্তম্ভিত! বিস্ময়টা কোনওমতে সামলাবার চেষ্টা করছেন। অপ্রস্তুতভাবে বললেন, "শিখী, তোমরা গল্প করো। আমি আসছি...!"
তাঁর কথার মধ্যে ভীত, সন্ত্রস্তভাব। দু'চোখে পলায়নপর দৃষ্টি। যেন এখনই এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচেন।
"দাঁড়াও।" গম্ভীর স্বরে বললেন গুরুজি, "চিরদিনই পালিয়ে পালিয়ে থেকেছ। আর নয়।" তিনি শিখীর দিকে তাকালেন, "তুমি চেনো ওঁকে?"
শাশুড়িমা যেন ধরা পড়া অপরাধীর মতো নিজের বুকে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে আছেন।
শিখী বিস্মিত হয়ে বলে, "উনি... মানে... উনি আমার মা... মানে শাশুড়িমা...!"
"না, শুধু সেটুকুই ওঁর পরিচয় নয়।" গুরুজির জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা বাড়িতে, "উনি রাধিকা গুপ্ত, বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী!"
শিখীর মনে হল, তার পায়ের তলার মাটি থরথর করে কাঁপছে! সে কাউকেই ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না... দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে... শরীর অবশ...!

বাইরে তখন খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। এখন কালবৈশাখীর সময়। মাঝে মধ্যেই তেড়েফুঁড়ে ঝড় এসে আছড়ে পড়ছে! আর তারপরই আদিগন্ত ভাসিয়ে উন্মত্ত বৃষ্টির খেপামি। বৃষ্টির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে আমের মুকুলের তাজা গন্ধ এসে ঝাপটা মারছে নাকে। সিক্ত হাওয়ার শিরশিরে আঙুল ছুঁয়ে যাচ্ছিল শিখীকে। তার অন্দরমহলেও জমে উঠেছে এক বিচিত্র বাষ্প! কেন এমন ছলনা! যে অনুগত, তার সঙ্গেও কি এমন খেলা খেলতে হয়?
"খোকার দোষ নেই। ও জানে না।" তার শাশুড়িমা, ওরফে রাধিকা গুপ্ত আস্তে আস্তে বললেন, "যখন পুষ্পল খুব ছোট ছিল, তখনও বাপের বাড়ি যাওয়ার অজুহাতে মায়ের কাছে রেখে গান গাইতে যেতাম। কিন্তু যখন বড় হল তখন আমার দায়িত্বও বাড়ল। আমার উপায় ছিল না শিখী। সংসার আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছিল। আমি তোমাদের মতো সাহসী নই যে সব ভাসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ব...। তাই...!"
শিখী একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। যে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরার জন্য সে এবং তার মতো আরও অনেকে লালায়িত—সেই মুকুটটি এই মহিলা কি অনায়াসেই না

শিখী অবাক হয়ে দেখল তার শাশুড়িমাও যেন স্তম্ভিত! বিস্ময়টা কোনওমতে সামলাবার চেষ্টা করছেন।

ত্যাগ করে এসেছেন! জীবনে আর কখনও ফিরেও তাকাননি! তা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই! আপশোসও নেই!
সে অবরুদ্ধ কান্নাকে বুকে চেপে রেখে বলল, "আমায় গান শেখাবেন মা?"
রাধিকা হাসলেন। তাঁর মুখের বলিরেখাগুলো স্নিগ্ধ আঁকিবুকি তৈরি করেছে, "গান তো তুমি চমৎকার শিখেছ মা। নতুন করে শেখানোর কিছু নেই। শুধু একটা কথা জেনে রাখো। আমি যে গানগুলো গেয়েছিলাম, তাতে শুধু কথা বা সুরই ছিল না। আমার ব্যথার অনুভব ও অভিমান মিশে ছিল। 'চিনিলে না আমারে কি', 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি', 'আমার সকল দুখের প্রদীপ' বা 'না বুঝে কারে তুমি ভালোলে আঁখিজলে'—এইসব গানগুলো আমার কাছে শুধু গান ছিল না। কবিগুরুর গানের কথাগুলো আমারই কথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে ব্যথা আমি পেয়েছিলাম তা তো তুমি পাওনি। তবে কোথায় পাবে সে অনুভব!"
শিখী মাথা হেঁট করে, "তবে আপনি কী নির্দেশ দেন?"
"যা তুমি উপলব্ধি করেছ, নিজের জীবন দিয়ে মর্মে মর্মে অনুভব করেছ ঠিক সেই গানই গাও। তবেই সে গান তোমার নিজস্ব হয়ে উঠবে।"
"তবে তাই গাই মা?"
"গাও।"
শিখী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বৃষ্টির টুপুর টাপুরকে ছাপিয়ে গান ধরে...
'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি।
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাইনি...।'
গাইতে গাইতে এতদিন যা অনুভব করেনি শিখী, আজ তাই করল। তার দু'চোখ বেয়ে উষ্ণ জলের ধারা বৃষ্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেয়ে পড়ছে। রাধিকার দিকে তাকিয়ে দেখল তাঁর চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন। হঠাৎ তার মনে হল, সুর যেন মুক্তি পেয়েছে। মুক্তি পেয়েছে তার জীবনবোধ! কণ্ঠ থেকে যেন নেমে গেছে এক অজ্ঞাত দায়ভার! এ গান রাধিকা গুপ্ত'র নয়। এ গান শিখী চট্টোপাধ্যায়ের। এ গান তারই অন্তরের আকুলতা! এ গান সম্পূর্ণ মৌলিক!
'আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাইনি...।'
শিখীর মনে হয়, কী প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ দর্শকের করতালির! কী প্রয়োজন প্রচারের ফ্ল্যাশলাইটের! যখন রাত নেমে আসে, বর্ষণমুখর হয়ে ওঠে রাত, পাতায় পাতায় বেজে ওঠে জলতরঙ্গ—তখন চুপিচুপি সামনে এসে বসেন 'নিভৃত প্রাণের দেবতা।' তখন শিখী শিল্পী নয়, সংগীতবিশারদ নয়, সংগীতজ্ঞ নয়!
ঠিক তখনই সার্থক হয় তার সাধনা। তখন সে শুধুমাত্র এক সাধিকা—এক আরাধিকা! আর কিছু নয়!
অলংকরণ: অনুপ রায়